তারিখ 24 OCT 2002
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

সংবাদ

আবারও শিক্ষা কমিশন

বাংলায় একটা প্রবাদ আছে 'নাই কাজ তো খই ভাজ'। বাংলাদেশে যারাই ক্ষমতাসীন হয়েছে,তাদের মধ্যে এ প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। অর্থাৎ আগের সরকার কাজটি ভাল করল কি খারাপ করল— সেটি বাছবিচার না করেই সবকিছু উল্টে দেয়া এবং নতুন কিছু করা। তুঘলকি কাণ্ড— বৈ কিছু নয়। মঙ্গলবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে শিক্ষানীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে আবারও একটি কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত হয়েছে। এ নিয়ে দেশে ষষ্ঠবারের মতো শিক্ষা কমিশন গঠিত হতে যাচ্ছে।

এখানে উল্লেখ করা যায় যে, দেশে একটি জাতীয় শিক্ষানীতি বহাল আছে। গত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান অধ্যাপক শামসুল হকের নেতৃত্বে গঠিত কমিশন সর্বস্তরের মানুষের মতামত নিয়ে একটি জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে। ১৯৭৪ সালে গঠিত ড. কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের আলোকেই এ নীতি প্রণীত হয়েছিল। পরবর্তীকালে এ শিক্ষানীতির কিছু কিছু ধারা বাস্তবায়নেরও উদ্যোগ নেয়া হয়। শিক্ষা পদ্ধতিকে সম্পূর্ণ ঢেলে সাজিয়ে বর্তমান কাঠামো পরিবর্তন করে ৮ বছরের প্রাথমিক শিক্ষা ও ৪ বছরের মাধ্যমিক শিক্ষা চালুর কথা বলা হয়েছিল এ নীতিতে। ২০০৩ সাল থেকে সেটি বাস্তবায়ন করার কথা ছিল। এ শিক্ষানীতির আলোকেই দেশে সাধারণ শিক্ষার বিপরীতে কারিগরি ও প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছিল। তৎকালীন সরকার এ লক্ষ্যে দেশে আরও ১২টি কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠারও উদ্যোগ নেয়। দুর্ভাগ্যজনক যে, সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেসব বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশের কার্যক্রম স্থগিত হয়ে যায়।

সরকার কি উদ্দেশ্যে নতুন করে আরেকটি শিক্ষা কমিশন গঠন করতে যাচ্ছে, তা স্পষ্ট নয়। শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর বক্তব্য অনুযায়ী একদিকে তারা বলছেন, সাবেক সরকারের প্রণীত শিক্ষানীতি তারা পর্যালোচনা করে দেখবেন এবং সেখানে ভাল কিছু থাকলে গ্রহণ করবেন, খারাপ কিছু থাকলে বর্জন করবেন। খুবই ভাল কথা। সরকারের উদ্দেশ্য যদি হয় আওয়ামী লীগ আমলের শিক্ষানীতি পর্যালোচনা করা, তাহলে নতুন কমিশন গঠনের প্রয়োজন কি? যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়ে একটি পর্যালোচনা কমিটি গঠন করে 'গ্রহণ-বর্জনের' কাজটি সমাধা করলেই হতো।

সেসব না করে নতুন করে একটি শিক্ষা কমিশনে গঠনের অর্থ হলো আগেরটি বাতিল করা এবং নতুন শিক্ষানীতির নামে অর্থের অপচয়। যেখানে সরকার অর্থাভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর দুরবস্থা লাঘবে কার্যকর উদ্যোগ নিতে পারছে না, হাজার হাজার শূন্য পদে নতুন শিক্ষক নিয়োগ দিতে পারছে না, সেখানে আরেকটি শিক্ষা কমিশনের নামে টাকার অপচয় ও শিক্ষানীতির ক্ষেত্রে শূন্যতা সৃষ্টি কোনভাবে গ্রহণযোগ্য নয়।

পূর্ববর্তী শিক্ষানীতিতে কি কি অসঙ্গতি বা ত্রুটি আছে, কিংবা কোনটুকু বর্তমান সরকারের কাছে অগ্রহণযোগ্য, সে সম্পর্কে সরকারিভাবে কিছু বলা হয়নি। তবে এর আগে সাবেক সচিব এরশাদুল বারীর নেতৃত্বে একটি শিক্ষা সংস্কার কমিটি গঠন করা হয়েছিল। সে কমিটির রিপোর্টে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ ও ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ সংশোধনের সুপারিশও ছিল। শিক্ষাঙ্গনে সেসব সুপারিশের তীব্র বিরূপ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করেই এ নিয়ে আর সরকার উচ্চবাচ্য করছে না। বরং নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়নের উদ্দেশ্যে আরেকটি কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে; কিন্তু কেন?

সরকার যেকোন বিষয়ে কমিশন গঠন করতে পারে। সে কমিশনের উদ্দেশ্য যদি সাধু হয়, তাহলে আপত্তি করার কিছু নেই। কিন্তু উদ্দেশ্যটাই যদি এমন হয় যে, আগের শিক্ষা নীতিটি আওয়ামী লীগ করেছে বলেই বাতিল করতে হবে— সে মানসিকতা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। ইতোপূর্বে জোট সরকার পূর্ববর্তী সরকারের অনেক কিছুই বাতিল করে দিয়েছে— যার কোন প্রয়োজন ছিল না। পূর্ববর্তী সরকার খারাপ কিছু করলে অবশ্যই বাতিল করার যৌক্তিকতা আছে। যেমন তারা জননিরাপত্তা আইন করেছিল, সে আইন বাতিলে জনগণ খুশিই হয়েছে। কিন্তু জোট সরকার জননিরাপত্তা আইন বাতিল করে দ্রুত বিচার আইন প্রণয়ন করেছে। মানবাধিকারের দৃষ্টিতে দুটোই খারাপ। পূর্ববর্তী সরকার স্বাধীনতা স্তম্ভ তৈরি করছিল বলে এ সরকার এসে তার কাজ স্থগিত করে দিয়েছে, এ মানসিকতা স্বৈরাচারী। স্বাধীনতার স্তম্ভ বা জাতীয় শিক্ষানীতি কোন সরকারের বিষয় নয়। পূর্ববর্তী শিক্ষা নীতিতে কোন ত্রুটি থাকলে সেটি সংশোধন করা যেতে পারে। কিন্তু তাই বলে পুরো নীতিটা বাতিল করার কোন যুক্তি থাকতে পারে না।

জাতীয় শিক্ষা নীতির নামে বহু টালবাহানা হয়েছে। জনগণের অর্থ অপচয় হয়েছে। এখন আর এ নিয়ে নতুন ভেল্কিবাজি না দেখানোই শ্রেয়। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে এ ধরনের তুঘলকি কাণ্ড অবিলম্বে বন্ধ হওয়া প্রয়োজন।